গদ্যকারের হাতের চাবুক : প্রমথ চৌধুরীর কবিতা

নীলাঞ্জন শাণ্ডিল্য

এ জাতে শেখাতে পারি জীবনের মর্ম,
হাতে যদি পাই আমি তোমার চাবুক!
(বার্নার্ড শ', *সনেট-পঞ্চাশৎ* : প্রমথ চৌধুরী)

বাংলা সাহিত্য প্রাঙ্গণে প্রমথ চৌধুরীর উপস্থিতি অনিবার্য তাঁর লিখনশৈলীর জন্য এবং তাঁর নতুন চিন্তাধারার জন্য। তিনি যে সাধু ভাষা পরিত্যাগ করে শিষ্ট, শহুরে চলিত ভাষার পথে চলবার অভিমুখ বাংলা গদ্যকে দেখিয়েছিলেন, আজও তা তেমন পালটায়নি। তরুণ প্রমথ এই অভিযানে যাত্রাসঙ্গী হিসেবে টেনে নিতে পেরেছিলেন বর্ষীয়ান রবীন্দ্রনাথকে, এতটাই ছিল তাঁর ভাষার শক্তি।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে তাঁর লেখা নজর কাড়তে শুরু করেছিল। বিশেষত আকর্ষণীয় হয়ে উঠল আধুনিক বাংলা ভাষার কাঙ্ক্ষিত অভিমুখ নিয়ে তাঁর লেখাগুলি। ১৯০৩ সালের 'কথার কথা', ১৯১৩ সালের 'বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধুভাষা' প্রভৃতি প্রবন্ধ সাড়া ফেলে দিয়েছিল। প্রথম প্রবন্ধটিতে তিনি বললেন, 'শুধু মুখের কথাই জীবন্ত। যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই, সেই ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়।' (কথার কথা, *নানা কথা* : প্রমথ চৌধুরী) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাল্যকথা' *ভারতী* পত্রিকায় প্রকাশিত হলে তখনকার ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন লেখাটির ভাষাভঙ্গি নিয়ে সমালোচনায় মন্তব্য করেন যে তা অপ্রকাশিত থাকাই উচিত ছিল। বলা হয় যে, 'রচনার নমুনা যে প্রকারের ঘরওয়ালা ধরণের, ভাষাও তদ্রুপ'। এই সমালোচনার বিরুদ্ধে 'বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধুভাষা' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী বলেন—

> ... ভাষা যদি বক্তব্য বিষয়ের অনুরূপ হয়, তাহলে অলংকারশাস্ত্রের মতে সেটা যে দোষ বলে গণ্য, এ জ্ঞান আমার পূর্বে ছিল না। আত্মজীবনী লেখবার উদ্দেশ্যই হচ্ছে ঘরের কথা পরকে বলা। ঘরোয়া ভাষাই ঘরোয়া কথার বিশেষ উপযোগী মনে করেই লেখক, লোকে যেভাবে গল্প বলে, সেইভাবেই তাঁর 'বাল্যকথা' বলেছেন। স্বর্গীয় কালী সিংহ যে হুতোম প্যাঁচার নক্‌শার ভাষায় তাঁর মহাভারত লেখেন নি, এবং মহাভারতের ভাষায় যে হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা লেখেন নি, তাতে তিনি কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেন নি।
>
> বঙ্গভাষা ওরফে বাবু-বাংলা ওরফে সাধুভাষা, *নানা কথা* : প্রমথ চৌধুরী

এসব লেখা কিন্তু তখন সাময়িকপত্রেই পাঠকের নজর কাড়ছে, বই হয়ে বেরোয়নি। কেবল *তেল নুন লকড়ি* নামে ১৯০৬ সালে *ভারতী* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি দীর্ঘ-প্রবন্ধ সম্ভবত ওই বছরই পুস্তিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়। পরে লেখাটি *নানা কথা* বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং আর পৃথকভাবে বেরোয়নি। *সবুজ পত্র* তখন তাঁর চিন্তায় আসেনি। এই রকম সময়ে, ১৯১৩ সালে তাঁর প্রথম গ্রন্থ *সনেট-পঞ্চাশৎ* প্রকাশ পেল। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে এটি কবিতার বই, পঞ্চাশটি সনেটের সংগ্রহ। এর আগে সাহিত্যপত্রে তাঁর সনেট প্রকাশিত হয়েছিল। শেষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চেষ্টায় চারটি সনেট *ভারতী* পত্রিকায় প্রকাশ পায়। সনেটগুলি বিখ্যাত সাহিত্যানুরাগী প্রিয়নাথ সেনের ভালো লাগে এবং প্রধানত তাঁর উৎসাহেই বইটি ছেপে বেরোয়, এ কথা কবি নিজেই লিখেছেন।

১৯১৩ সন ভারতবর্ষের ইতিহাসে, বিশেষত বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে স্মরণীয়। অসুস্থ বিদেশবাসী রবীন্দ্রনাথের তিন বছর আগে প্রকাশিত কিছু কবিতার অনুবাদ সংবলিত *গীতাঞ্জলি* বইটি নোবেল পুরস্কার এনে দিল। ইউরোপ-আমেরিকার ভৌগোলিক বৃত্তের বাইরে এই প্রথম কেউ সাহিত্যে নোবেল পেলেন। নোবেল পাওয়ার আগেই বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের গভীর প্রভাব পড়েছিল; অনেক লেখকই তখন রচনাকৌশলে রবীন্দ্রানুসারী। এ ব্যাপারটি প্রমথ চৌধুরীর নজর এড়ায়নি, তাঁর সনেটে তিনি এর সমালোচনাও করেছেন।

প্রমথ চৌধুরী তাঁর বাংলা গদ্যে যেমন নতুন কিছু এনেছিলেন, কবিতাতেও তাই। এ নয় যে তিনিই বাংলায় প্রথম সনেট লিখলেন। সে কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে মাইকেল মধুসূদন দত্তের। ইতালির ভার্সেই শহরে বসে মধুসূদন প্রথম বাংলা সনেটটি লেখেন। তারপর ক্রমশ তাঁর সনেট-সংগ্রহের বই বেরোয়। এরপর বাংলায় ইউরোপীয় কাব্যের এই ফর্মটি আরও অনেকে ব্যবহার করলেন। তার মধ্যে আছেন দেবেন্দ্রনাথ সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কামিনী রায়, মোহিতলাল মজুমদারের মতো পূর্বসূরি। রবীন্দ্রনাথের কিছু সনেট অবশ্য ব্যতিক্রমী। মধুসূদন সনেটের বাংলা নামকরণ করলেন— চতুর্দশপদী। এ নামের দু-টি তাৎপর্য। সনেটে চোদ্দোটি পঙ্‌ক্তি থাকে আর তার সঙ্গে মধুসূদন সনেটের ছন্দে আনলেন চোদ্দো অক্ষরের পয়ার। ছন্দের এই মধুসূদনকৃত নিয়মটি অনেকদিন পর্যন্ত মেনে চলা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সময় পর্যন্ত তো বটেই, রবীন্দ্রোত্তর যুগেও এই বাঁধুনি বহুদিন মেনে চলা হয়েছিল। পথিকৃৎ না হয়েও প্রমথ চৌধুরী বাংলা সনেটে একটি নতুন হাওয়া আনেন। তবে, তাঁর সনেট নিয়ে আলোচনা করার আগে বিশ্বসাহিত্যে ও বাংলা সাহিত্যে সনেটের উদ্ভব ও বিকাশের পথটি সংক্ষেপে হলেও পরিক্রমা করে নেওয়া যাক। যদিও বাংলা সাহিত্যের আন্তরিক পাঠকদের কাছে এসব জানা কথা, তবু এ পরিক্রমা প্রয়োজন, কারণ আমাদের গদ্যকার কবি কোন পাদপীঠে তাঁর ভাস্কর্য নির্মাণ করছেন, তা আমাদের একবার বুঝে নিতে হবে। প্রমথ চৌধুরী অবশ্য সনেট ছাড়াও অন্য আঙ্গিকে কবিতা

লিখেছেন; সে কথায় আমরা পরে আসব। তিনি যেহেতু মাইকেলের চতুর্দশপদী নামটির পরিবর্তে বিদেশি সনেট নামটি ব্যবহার করেছেন, তাই তাঁর লেখার আলোচনায় আমরাও তাই করব।

সনেট শব্দ ও কাব্যরূপ, দু-টিরই উৎপত্তি ইতালিতে। ইতালীয় ভাষায় শব্দটি সোনেত্তো, যার অর্থ গীতিকা বা গীতি-কবিতা। বাংলায় যেমন প্রথমদিকের সনেট সবই এক ছন্দে, ইউরোপীয় সব ভাষাতেও তাই; তার ছন্দ দশ পদাংশের বা সিলেব্‌লের আয়াম্বিক পেন্টামিটার। ইতালীয় সনেটের দু-টি ভাগ— অষ্টকে ও ষষ্ঠকে। এই সনেটের স্রষ্টা ইতালীয় কবি গুইভা ক্যাভালকান্তি হলেও, তাঁর উত্তরসূরি পেত্রার্ক (প্রমথ চৌধুরীকৃত বানানে পেত্রার্কা) চতুর্দশ শতকে একে বিখ্যাত করেন। তাই সনেটের কথা উঠলেই আজও তাঁর কথাই প্রথমে মনে পড়ে। তেমনই, ইংরেজি চতুর্দশপদীর প্রাথমিক কবি খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর টমাস ইউয়াট। কিন্তু এর প্রচলন প্রবল হয়ে ওঠে স্যার ফিলিপ সিডনির মাধ্যমে। তার পরের দুই শতকে উইলিয়াম শেক্‌সপিয়র, এডমন্ড স্পেন্সার, মাইকেল ড্রায়টন প্রমুখ প্রধান কবিরাও এই গঠনশৈলীকে গ্রহণ করলেন। পঙ্‌ক্তি সংখ্যায় ও ছন্দে ইউরোপীয় সনেট একপথের পথিক হলেও পঙ্‌ক্তি-বিভাজনে বা অন্ত্যমিলে নয়। সনেটের অন্ত্যমিলে সাধারণত এক পঙ্‌ক্তির সঙ্গে পরের পঙ্‌ক্তি মেলে না। মিলের ক্ষেত্রে প্রথম অষ্টককে চার-চারের দু-টি অংশে ভাগ করা হয় এবং দ্বিতীয় ষষ্টককে তিন-তিনে, চার-দুইয়ে বা দুই-চারে। এই মূল কাঠামোর মধ্যেও ব্যতিক্রম আছে। যদিও প্রত্যেকেই তাঁদের কবিতায় বিভিন্ন সময়ে সামান্য বদল এনেছেন, তবু তার সামান্য লক্ষণ মোটামুটি এক।

পেত্রার্কীয় সনেট প্রায়ই এই ধরনের— কখখক/ কখখক/ গঘগ, কিংবা ... গঘঙ/ গঘঙ, কিংবা ... গঘগঘগঘ ইত্যাদি।

ইংরাজি সনেটের অন্যতম প্রতিভূ শেক্‌সপিয়রের সনেট আবার সাধারণত এই ধরনের— কখকখ/ গঘগঘ/ চছচছ/ জজ।

উদাহরণস্বরূপ দুই কবির একটি করে সনেটের অনুবাদ নীচে দেওয়া হল। মিলের কবিকৃত নিয়ম দু-টি ক্ষেত্রেই রক্ষা করা হয়েছে। ইউরোপীয় সনেটের মাত্রানুসারী ছন্দের চলন রাখতে গিয়ে অক্ষরবৃত্তকে বর্জন করতে হল। প্রথম কবিতায় মাত্রা চোদ্দোটি করে, কিন্তু দ্বিতীয়টি কুড়িটি—

পেত্রার্ক

মিষ্টি বাতাস বিলি কাটে তার চুলে।
মেঘের মতন ভেসে ভেসে এসে মেশে।
ভাঁজ থেকে ভাঁজে— উজ্জ্বল সেই কেশে।
জড়ো করে কেশ আবার তা দেয় খুলে।
সে নয়নে তারা এসে থামে যেন ভুলে—

যে দুটি নয়ন আমার হৃদয়ে হানে
ভ্রূ-ধনুক-চ্যুত প্রাণ কেড়ে নেওয়া বাণে—
কেশ থেকে কেশে চলতে চলতে দুলে।

সব হারানোর দুঃখে বাউন্ডুলে
ঘুরি ফিরি আমি, যেন নিশি পাওয়া ঘোরে।
এই খুঁজে পাই, আবার হারাই যেন
এ জগতে আমি এসেছি মনের ভুলে।
হে সুখী বাতাস, ঘুরিস কী সুখভরে?
তোর সাথে কেন আমিও যাই না ভেসে?

শেক্‌সপিয়র

আমার প্রিয়ার চোখদুটি নয় সূর্য-সমুজ্জল,
টুকটুকে তার ঠোঁট দুটি নয় প্রবালের মতো লাল,
তুষার শুভ্র নয় স্তনদ্বয়, তারা যেন পিঙ্গল।
কেশ নয় তার, মেঘের মতন ঘনঘোর জটাজাল।
আমি তো দেখেছি লালিমায় মাখা ফোটা গোলাপের রূপ
লাজে রাঙা সেই মেয়ের কপোলে তেমন আভা কি আসে?
যেমন ছড়ায় আনন্দ বাস সুগন্ধী কোন ধূপ
তেমন সুবাস পাইনি তো তার বিষণ্ণ নিঃশ্বাসে।

বড়ো মিঠে লাগে প্রিয়ার আমার অস্ফুটে কথা বলা
তবুও সুরেলা গানের মতন নয় তার মধুরতা।
যদিও এ চোখে পড়েনি কখনো দেবীদের হাঁটাচলা
প্রেয়সী আমার মাটিতেই চলে, জানি সেইটুকু কথা।

আমার প্রেয়সী আমারই প্রাণের, তাকে বড়ো ভালোবাসি।
কী কাজ আমার, দিয়ে উপহার মিথ্যে তুলনারাশি।

বাংলা সনেটের উদাহরণ টেনে লেখাটির কলেবর বাড়িয়ে লাভ নেই। দেখা যাচ্ছে অনূদিত দু-টি সনেটই প্রেমের। তখনও পর্যন্ত ইউরোপীয় সনেটের মূল উপজীব্য ছিল প্রেম আর রোম্যান্টিকতা। বাংলাতেও তাই। প্রমথ চৌধুরীর সনেট কিন্তু দেখা দিল তীক্ষ্ণ, ব্যঙ্গধর্মী গদ্যের হাত ধরে। বইয়ের প্রথম সনেটে তিনি পেত্রার্কের বন্দনা করছেন নিজস্ব ধরণে—

পেত্রার্কা-চরণে ধরি করি ছন্দোবন্ধ,
যাঁহার প্রতিভা মর্ত্যে সনেটে সাকার।

একমাত্র তাঁরে গুরু করেছি স্বীকার,
গুরুশিষ্যে নাহি কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধ!

গুরু সম্বোধন করলেও পেত্রার্কীয় রীতি তিনি পুরোপুরি অনুসরণ করেননি। ফরাসি ধরনের অনুসরণে তাঁর সনেটে দ্বিতীয় ষষ্ঠকটি আবার দু-টি উপবিভাগে বিভক্ত— ২ ও ৪। শুধু তাই নয়, ফরাসি সনেটের ৮/২/৪ এই তিন ভাগে ভাবের যে বিস্তার-সংহরণ, তিনি মোটামুটি তাকেই অনুসরণ করেছেন। তাঁর ভাষায় তাঁর সনেটের 'বংশীধারী ত্রিভঙ্গরূপ'। এবার দেখা যাক কবিতাটির শেষাংশ—

ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন,
শিল্পী যাহে মুক্তি লভে, অপরে ক্রন্দন॥

ইতালীর ছাঁচে ঢেলে বাঙ্গালীর ছন্দ,
গড়িয়া তুলিতে চাই স্বরূপ সনেট।
কিঞ্চিৎ থাকিবে তাহে বিজাতীয় গন্ধ—
সরস্বতী দেখা দিবে পরিয়া বনেট!
(সনেট, *সনেট-পঞ্চাশৎ* : প্রমথ চৌধুরী)

কবিতা লেখার ধাঁচা হিসেবে তিনি কেন সনেটকে বেছে নিয়েছেন তা প্রথমে স্পষ্ট করে দিলেন। গঠনে ইউরোপীয় হলেও তাঁর কাব্য প্রাণে ভারতীয়; তাই অননুকরণীয় শেষ পঙ্‌ক্তিটি— 'সরস্বতী দেখা দিবে পরিয়া বনেট!' এই সনেট-নামক সনেটটি লিখেই তিনি বাংলা কবিতার দরবারে তাঁর স্থান পাকা করলেন। তাঁর লেখনীতে দেখা দিল পরিশীলিত কণ্ঠের ঈশ্বর গুপ্তীয় শানিত ব্যঙ্গ।

বাংলা সাহিত্য চিরকালই নূতনকে গ্রহণ করতে কুণ্ঠা করেছে। বিভূতিভূষণ যে তাঁর *পথের পাঁচালী*-র পাণ্ডুলিপি নিয়ে প্রকাশকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছিলেন, সেই ঘটনাটিই এই প্রতিপাদ্যকে প্রমাণ করবার পক্ষে যথেষ্ট। বঙ্কিম স্বয়ং এবং আরও কতিপয় রসজ্ঞ যদি তরুণ রবীন্দ্রনাথের একেবারে নতুন ধরনের কবিতাগুলোর দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ না করতেন, তা হলে হয়তো তাঁর পাঠক জুটতে দেরি হত। প্রমথ চৌধুরীর এই বইটিও সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল। সম্পাদক-প্রত্যাহিত তাঁকে গোড়ায় উৎসাহ দিয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রিয়নাথ সেন। কিন্তু, বই বেরোনোর পর আর তেমন সাড়া মিলল না। কোনো সাময়িকপত্রেই আলোচনা বেরোচ্ছে না দেখে যখন ভাবছেন তাঁর 'অল্টার ইগো' বীরবলকে দিয়েই সমালোচনা লেখাবেন, তখনই *ভারতী* পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একটি অসাধারণ আলোচনা বেরোল। ওই মাসেই *সাহিত্য* পত্রিকায় লিখলেন প্রিয়নাথ সেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও বইটি পাঠে প্রীত হয়ে কবিকে চিঠিতে তা জানালেন। আমরা আগেই দেখেছি বইটি যখন প্রকাশ পাচ্ছে

রবীন্দ্রনাথ তখন বিলেতে। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর সে সময় যখন কার্যপোলক্ষ্যে ও-দেশে যান তখন তাঁর সঙ্গে একখানা *সনেট-পঞ্চাশৎ* ছিল। সেটি রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ল। বইটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ একমাসের ব্যবধানে প্রমথ চৌধুরীকে এবং তাঁর স্ত্রী ও নিজের ভাইঝি ইন্দিরা দেবীকে চিঠি লেখেন। চিঠি দু-টিতে বইয়ের যে রবীন্দ্রকৃত প্রশংসা, তাকে বিনয়বশত প্রমথ চৌধুরী 'অতিপ্রশংসা' বলে উল্লেখ করেছেন।

কী বললেন রবীন্দ্রনাথ? পাঠপ্রতিক্রিয়ায় ইন্দিরা দেবীকে তিনি জানাচ্ছেন— 'বীণাপাণিকে প্রমথ খড়্গপাণি মূর্তিতে সাজাবার আয়োজন করেছেন।' তাঁর কবিভাষায় তিনি বলছেন—

> আমার যক্ষবধূর কথা মনে পড়ল— এই বইখানির কবিতা তন্বী, আর ওর দশনপঙ্‌ক্তি তীক্ষ্ণ শিখরওয়ালা, একটিও ভোঁতা নেই— 'মধ্যে ক্ষামা', দুটি লাইনের কটিদেশটি খুব আঁট— তার উপরে 'চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা'।

প্রমথকে লিখছেন—

> তোমার সনেট-পঞ্চাশৎ পড়ে আমি খুব খুশি হয়েছি। ... এ যেন ইস্পাতের ছুরি, ... ফলাগুলি ওস্তাদের হাতের তৈরি— তীক্ষ্ণধার হাস্যে ঝকঝক করচে— কোথাও অশ্রুর বাষ্পে ঝাপ্‌সা হয়নি— কেবল কোথাও যেন কিছু কিছু রক্তের দাগ লেগেছে। বাংলার সরস্বতীর বীণায় এ যেন তুমি ইস্পাতের তার চড়িয়ে দিয়েছ।

আগন্তুক কবির পক্ষে বিরাট প্রাপ্তি। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু নিছক প্রশংসা করেননি। প্রমথ চৌধুরীকে যে তিনি 'রক্তের দাগ' লাগবার কথা বলেছেন, ওর মধ্যে প্রচ্ছন্ন সমালোচনা আছে। বোধহয় বলতে চেয়েছেন সমালোচনা কোথাও কোথাও বেশি কড়া হয়ে সাহিত্যের পরিমিতগুণ লঙ্ঘন করেছে। ইন্দিরা দেবীর চিঠিতে তিনি আর একটি মোক্ষম কথা বলেছেন। তা হল— 'এখন পাঠকের মনকে প্রতিছত্রে ফুটিয়ে দেবার দিকে এর যে ঝোঁক আছে সেটা আপনি ফুটে ওঠবার দিকেই সম্পূর্ণ হবে ...' প্রমথবাবুর কাব্য ফুটে ওঠবার দিকে কতটা অগ্রসর হতে পেরেছিল তা আমরা ক্রমশ দেখব।

অনেক পরে প্রমথ চৌধুরী অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের চিঠি পড়ে তিনি একটু অবাক হন— 'কেননা আমার সনেট যদি কবিতা হয় তাহলে সে কবিতা রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী।' এই ভিন্নতা বোঝাতে তিনি বলছেন—

> রবীন্দ্রনাথের lyric মূলত গীতধর্মী— তার flow অসাধারণ। সনেট হচ্ছে আমার মতে sculpture-ধর্মী— এর ভিতর উদ্দাম flow নেই। যেটুকু গতি আছে তা সংহত ও সংযত।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও বইটি পড়বার পর তাঁর চিঠিতে তাঁর নিজস্ব ভাষায় এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন—

> তোমার পুস্তকখানির মধ্যে কবিআনা ঢং একটুও নাই, অথচ রস আছে বেশ একরকম অম্লমধুর গোছের অতি মনোহর; তাই তাহা বড্ড আমার ভাল লাগিল।

প্রথম চৌধুরী নিজের লেখবার শক্তি ও ব্যাপ্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধান ছিলেন। তাঁর কথায়—

> আমি যে সনেট লিখেছি সে অনেকটা experiment হিসাবে ... আমার সনেটের অন্তরে হয়ত art-র চাইতে artificiality বেশি। ... আমি আসলে গদ্যলেখক তা আমি জানি।

তাঁর প্রতিভা যে গদ্যরচনার দিকেই বেশি ঝুঁকে আছে এবং তা খেয়ালে না রাখলে কবিতার পরিণাম কী হতে পারে তা নিয়ে তিনি আবার বলছেন—

> সত্য কথা বলতে গেলে, সনেটগুলি আমি নির্ভয়ে লিখি কিন্তু ভয়ে ভয়ে প্রকাশ করি। তার কারণ, সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় যে, লেখকেরা প্রায়ই পদ্য হতে ক্রমে গদ্যে প্রমোশন পেয়ে থাকেন। ... তার উল্টো ব্যাপারটা সাহিত্যজগতের ইভোলিউশনের নিয়ম-বিরুদ্ধ।

তাঁর মতে লেখকদের মধ্যে অনেকেই যখন এরকম করতে গেছেন, তখন 'অসি ছেড়ে বাঁশি ধরবামাত্রই তাঁদের প্রতিভার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়েছে।'

এই হল প্রমথ চৌধুরীর প্রথম কাব্যগ্রন্থের প্রথম পাঠের প্রতিক্রিয়া। এর প্রতিক্রিয়ায় তিনি 'সনেট কেন চতুর্দশপদী' নামে সনেটের গঠন-বিষয়ক একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন। সে আলোচনায় আমরা যাব না। আমরা এবার তাঁর দ্বিতীয় ও শেষ কবিতার বইয়ের কথায় আসি। *পদচারণ* নামের এই বইটি প্রকাশিত হয় প্রথম বইটির প্রায় সাত বছর পর ১৯২০ সালে। বইটি কবি উৎসর্গ করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে। এই বইতেও মোট পঞ্চাশটি কবিতার অধিকাংশই সনেট। এর মধ্যে কিছু আগে লেখা, কিন্তু সেগুলো *সনেট-পঞ্চাশৎ*-এর অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সে বইয়ের পঞ্চাশটি সনেটই ফরাসি ধাঁচে নির্মিত, অর্থাৎ ৮/২/৮ বিভাজনে। কিন্তু, এ বইয়ের সবগুলি সেরকম নয়। ৮/৬ বিভাজনের ইতালীয় ধাঁচে নির্মিত আছে বেশ কয়েকটি— বিলাতে রবীন্দ্র, কবিতা লেখা, বন্ধুর প্রতি ইত্যাদি। তা ছাড়া অন্য নানা ফর্মের কবিতা বেশ কয়েকটি আছে যেমন— ট্রায়োলেট (তেপাটি), আট পঙ্‌ক্তির তেরজা রিমা, দুই পঙ্‌ক্তির দুয়ানি, চার পঙ্‌ক্তির সিকি। প্রমথ চৌধুরী কবিতার পঙ্‌ক্তি, পদ ও মিলের গঠন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেও ছন্দের ক্ষেত্রে বরাবর অক্ষরবৃত্তেই আশ্রয় নিয়েছেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল তিনি গদ্যে চলিত ভাষার গোঁড়া প্রবক্তা হলেও কবিতায় সাধু ভাষা ও কাব্য ভাষা অনায়াসেই ব্যবহার করেছেন কোনো ছুঁৎমার্গ না দেখিয়েই। এ দু-টি বইয়ের বাইরেও অপ্রকাশিত বা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত ওঁর কয়েকটি লেখা থেকে গিয়েছিল। *সনেট-পঞ্চাশৎ* ও *পদচারণ*-এর সঙ্গে সেই আটটি কবিতা, একটি কাব্যনাটক ও একটি গান যুক্ত করে তাঁর কবিতাসমগ্র বেরোয়, যার নাম দেওয়া হয় *সনেট-পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা*। কবিতা ছাড়াও এ বইয়ের শেষ অংশটি মূল্যবান, যাতে গ্রন্থ পরিচয় নামে তাঁর কাব্যের দীর্ঘ আলোচনা, সত্যেন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথ সেনের পূর্বোল্লেখিত সমালোচনাগুলি এবং নিজের

কবিতা প্রসঙ্গে তাঁর স্বলিখিত পত্রাদি যুক্ত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ এমনিতে সনেটের ফর্মে কবিতা লেখেননি। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী তাঁকে পদচারণ উৎসর্গ করলে তিনি একটি জবাবি চিঠি লেখেন আর সে চিঠিতে জুড়ে দেন নিঁখুত সনেটে লেখা একটি পরিহাসময় কবিতা। কেন কে জানে, সনেটটির শেষে তিনি অতিরিক্ত চারটি পঙ্‌ক্তি জুড়ে দেন। কবিতাটির প্রতিপাদ্য হল এই যে, চিঠি লেখার নানা হাঙ্গামার কারণে তিনি সাধারণত লেফাফা বা চিঠি লিখে উঠতে পারেন না। কবিতাটি থেকে অন্তত দুটো লাইন উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না—

লেফাফা দুরস্থ অতি, পোস্টাপিসে বিকিকিনি তার
লেফাফা-দুরস্ত হওয়া তাই আর হল না আমার।
(সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রমথ চৌধুরীকে লেখা চিঠিতে)

এতক্ষণ ধরে প্রমথ চৌধুরীর কাব্যপরিসীমার ভৌগোলিক পরিসীমা নির্ণয় করা গেল। এবার তার মর্মস্থলে প্রবেশ করা যাক। নানা ফর্মের কবিতা লিখলেও যেহেতু প্রমথ চৌধুরী প্রধানত সনেটই লিখেছেন, তাই আমরা তাঁর সনেটগুলোই আগে নাড়াচাড়া করি। তিনি তাঁর কবিতায় বাংলা সাহিত্যকে নতুন কিছু দিলেন যেমন গঠনবৈচিত্র্যে, তেমনই ভাবের দিক থেকে। তিনি রোমান্টিক আবেগ থেকে অনেকটা বেরিয়ে এসে স্বচ্ছবুদ্ধির দিকে জোর দিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথের কাব্যকৃতি বাংলার সাহিত্যাঙ্গনে উত্তুঙ্গ পাহাড়চূড়ার মতো দৃশ্যমান। প্রমথ চৌধুরীও তাঁর কাছের লোক। তবু তিনি কবিতা লিখছেন রবীন্দ্রনাথের বিপরীত ভাবের আশ্রয় নিয়ে। একই বিষয়ে, একই শিরোনামে লেখা দু-জনের কয়েকটি কবিতা পাশাপাশি রাখলেই প্রভেদ কতটা বোঝা যাবে। যেমন রবীন্দ্রনাথ, যেখানে তাঁর বিখ্যাত 'তাজমহল' কবিতায় লিখছেন 'কালের কপোলতলে শুভ্র, সমুজ্জ্বল এ তাজমহল', সেখানে একই নামের কবিতায়, যাঁর স্মৃতিতে শাজাহান সৌধটি নির্মিত করেছিলেন, সেই বেগম মমতাজকে, প্রমথ দেখছেন অ-রোম্যান্টিক নির্মোহ দৃষ্টিতে—

আঁখিতে সূর্মা-রেখা, অধরে তাম্বূল,
হেনায় রঞ্জিত তব নখাগ্র রাতুল,
জরিতে জড়িত বেণী, রুমালে সুবাসিত,—
বাদশার ছিলে তুমি খেলার পুতুল!
(তাজমহল, *সনেট-পঞ্চাশৎ* : প্রমথ চৌধুরী)

আবার যে চোর কবি রবীন্দ্রনাথের সম্বোধনে 'সুন্দর চোর', তাঁর কবিতা নিয়ে প্রমথ চৌধুরী লিখছেন—

দিয়েছিল দেখা বিশ্ব বিদ্যারূপ ধরি,
কনকচম্পকদামে সর্বাঙ্গ আবরি,

সুপ্তোত্থিতা, শিথিলাঙ্গী, বিলোলকবরী,
প্রমাদের রাশিসম অবিদ্যা-সুন্দরী!
(চোরকবি, *সনেট-পঞ্চাশৎ* : প্রমথ চৌধুরী)

'বালিকা বঁধু' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি আধ্যাত্মিক ভাবের কবিতা আছে *খেয়া* বইতে। প্রমথ চৌধুরী ওই নামের কবিতায় তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালি যুবকদের বালিকা-বিবাহকে ব্যঙ্গ করে লিখছেন—

বাঙ্গলার যত নব যুবা কবিবঁধু,
যুবতী ছাড়িয়ে এবে ভজিছে বালিকা।
তাদের চাপিয়া ক্ষুদ্র হৃদয়-নালিকা,
চোঁয়াতে প্রয়াস পায় তাজা প্রেম-মধু!
(বালিকা বঁধু, *সনেট-পঞ্চাশৎ* : প্রমথ চৌধুরী)

তাঁর কৃষ্ণনগরীয় বন্ধু ছিলেন কবি, নাট্যকার, গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যাঁর শেষদিকের সম্পর্ক খুবই বিরূপ, শান্তিনিকেতনবাসী প্রমথ চৌধুরী তাঁর মৃত্যুতে তাঁকে স্মরণ করে নির্দ্বিধায় লেখেন—

উদার আঁধার-মাঝে বিদ্যুতের মত
উঠেছিল ফুটে তব ক্ষিপ্র তীব্র হাসি
ঘনঘোর মেঘে ঘেরা দিগন্ত উদ্ভাসি।
(দ্বিজেন্দ্রলাল, *পদচারণ* : প্রমথ চৌধুরী)

প্রকৃতি বা প্রেমের আবহেও তিনি অমসৃণ ধারালো। যেমন, ফুল নিয়ে কবিতা—

রূপে গন্ধে মানি তুমি জগতে অতুল,
পূজায় লাগে না কিন্তু, অনার্য গোলাপ!
দেমাকে দেবতাসনে কর না আলাপ,—
ফুলের নবাব তুমি নবাবের ফুল!
(গোলাপ, *সনেট-পঞ্চাশৎ* : প্রথম চৌধুরী)

অথবা প্রেমের কবিতা—

আকাশে বিদ্যুৎ আজো খেলে তলোয়ার,
চাঁদের চুম্বনে ওঠে সাগরে জোয়ার।
পূর্ণিমা আজিও ঘুরে আসে পক্ষে পক্ষে,
আজিও প্রকৃতি আছে সবুজ, সৌখীন্,
নরনারী আজো ধরে পরস্পরে বক্ষে,—
অমানুষে পরে শুধু ডোর ও কৌপীন্!
(ধরণী, *সনেট-পঞ্চাশৎ* : প্রমথ চৌধুরী)

এক বাঙালি তরুণ বিলেতে গিয়ে এক শ্বেতাঙ্গিনীর প্রেমে পড়ে ইংরেজিতে কয়েকটি প্রেম-বিরহের সনেট লেখেন। সনেটগুলি ভালো লাগায় প্রমথ চৌধুরী সেগুলির অনুবাদ করেন সনেট-সপ্তক নাম দিয়ে। কিন্তু এখানেও তাঁর তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ঢাকা থাকে না। এই সনেটগুচ্ছের শেষ সনেটটির শেষ চার পঙ্‌ক্তি দেখা যাক—

কতকাল রব বল শুধু স্মৃতি নিয়ে?
অশ্রুজলে যাক বুকে ছবি ধুয়ে মুছে।
অলীক সাদার মোহ যাক মনে ঘুচে—
করিব স্বদেশে ফিরে কাল মেয়ে বিয়ে॥

(সপ্তম, সনেট-সপ্তক, *পদচারণ* : প্রমথ চৌধুরী)

আর একটি সনেটে তিনি বাণপ্রস্থের প্রতি অনীহা জানাচ্ছেন—

কখনো যাব না আমি পঞ্চাশোর্ধে বনে।
যৌবনে এ মনে ছিল জীবনে বিরাগ,
সেকালে সকালে প্রাণে বাজিত শ্রীরাগ।
পেয়েছি যৌবনশেষে সঞ্চিত জীবনে॥

(পঞ্চাশোর্ধে, *সনেট-পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা* : প্রমথ চৌধুরী)

প্রায় সব কবির মতোই প্রমথ চৌধুরীকে বিশ্ব-ব্যাপার আকর্ষণ করে। কিন্তু, তিনি তাতে ভেসে না গিয়ে তাকে বুঝতে চান। স্বভাবে কিছুটা সংশয়বাদী হলেও তিনি আস্তিক্যের দিকে ঝুঁকে। বিশ্বাসের এই অনবস্থিতি তাঁর কবিতাকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। তিনি অবাক হয়ে ভাবেন—

কে জানে কাহার বিশ্ব,— দৃশ্য চমৎকার!
আলোকে আঁধারে এই খোলা আর মেলা,
জড়েতে চৈতন্যে এই লুকোচুরি খেলা,
তারি মাঝে মূল তানে ওঠে ঝনৎকার॥

(বিশ্বরূপ, *সনেট-পঞ্চাশৎ* : প্রমথ চৌধুরী)

বিশ্বনিয়ন্তা কোনো ঈশ্বর যদি থাকেনও তিনি তাঁকে বুঝে উঠতে পারেন না, অন্য কেউ বুঝেছে বলেও মনে হয় না—

তোমার নামেতে সবে মিছে কথা বলে,
সকলে জানিত যদি তোমার স্বরূপ,
কিছুই থাকিত নাকো এখন যেরূপ—
তোমার নামেতে শুধু মিছে কথা চলে।

(ওঁ, *পদচারণ* : প্রমথ চৌধুরী)

তীক্ষ্ণধী কবিও মাঝে মাঝে সরলবিশ্বাসের আশ্রয় নেন। একটি কাহিনিমূলক সনেটে তিনি বাল্যকালের একটি ঘটনা স্মরণ করেন। একবার প্রতিমা-ভাসান দেখতে গিয়ে রাত্রিবেলায় পথ হারিয়ে এক শ্মশানের সম্মুখে পৌঁছিয়ে যখন তিনি ভয়ে বিহ্বল, তখন মশাল হাতে এক ফকির তাঁর সামনে হাজির হন। এখনও নিরাশার মুহূর্তে ফকিরের উচ্চারিত সেই মন্ত্রটি তাঁর মনে পড়ে—

আজিও নিরাশা বুকে চাপালে পাষাণ,
কানেতে না পশে মোর দুনিয়ার হাল্লা।
হৃদয়-ফকির জপে 'লা-আল্লা-ইলাল্লা',
আকাশেতে শুনি বাণী 'মুস্কিল-আশান'।
(মুস্কিল-আশান, *পদচারণ* : প্রমথ চৌধুরী)

তাঁর ঈশ্বর-চেতনায় কোনো মূর্তি আসে না। সে খোঁজের ঝোঁক নিরাকারের দিকে। 'প্রতিমা' নামের একটি নিটোল ও ভাববদ্ধ সনেটে তিনি মনোপ্রতিমা নির্মাণের কথা বলেন। বহু যত্নে, বহু রত্নরাজি খচিত করে তিনি দেবী প্রতিমাটি সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়েছেন। সে প্রতিমার—

... প্রজ্জ্বলিত ইন্দ্রনীলে খচিত নয়ন,
প্রান্তে লগ্ন প্রবালেতে গঠিত শ্রবণ,
মুকুতা-নির্ম্মিত যুগ্ম ঘন-পীন-স্তন,
সুকঠিন পদ্মরাগে গঠিত চরণ।
(প্রতিমা, *সনেট-পঞ্চাশৎ* : প্রমথ চৌধুরী)

কিন্তু, তবু তা প্রাণহীন। কবিতাটি শেষ হচ্ছে নাটকীয়ভাবে—

অপূর্ব সুন্দর মূর্তি, কিন্তু অচেতন,—
না পারি পূজিতে কিম্বা দিতে বিসর্জ্জন!
(প্রতিমা, *সনেট-পঞ্চাশৎ* : প্রমথ চৌধুরী)

এবার সনেট ছেড়ে অন্য ধাঁচের কবিতায় আসা যাক। আমরা দেখেছি আর যে যে ধাঁচে তিনি কবিতা লিখেছেন, সেগুলিও পঙ্‌ক্তি সংখ্যা ও অন্ত্যমিলের নিয়মের নিগড়ে বাঁধা। যেমন— ট্রায়োলেট, তেরজা রিমা, দুয়ানি ইত্যাদি। অন্য রকমের কবিতাতেও তিনিই প্রায়ই নিজেকে মিলের পরীক্ষায় ফেলেছেন। *সনেট-পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা*-র শেষে পূর্বে অগ্রন্থিত যে কবিতাগুলি স্থান পেয়েছে, তার মধ্যে দু-টি দীর্ঘ কবিতা হল 'পত্র' ও 'উত্তর'; দু-টিই আগাগোড়া একটি অন্ত্যমিলে লেখা! তাঁর প্রথম বইয়ের প্রথম কবিতায় যে তিনি লিখেছিলেন শিল্পের মুক্তি নিয়মের বন্ধনের মধ্যেই, তাঁর কাব্যসৃষ্টিতে তা তিনি বরাবর মেনে চলেছেন। দোপাটি নামক দুই পঙ্‌ক্তির কবিতায় গাথা সপ্তশতীর সাবলীল অনুবাদের একটি

উদাহরণ দেখা যাক— 'অদর্শনের প্রেম যায়, অতি দরশনে,/ পরের কথায়, কিম্বা শুধু অকারণে।' (দোপাটি, *পদচারণ* : প্রমথ চৌধুরী) দু-টি ব্যঙ্গাত্মক দুয়ানি দেখে নেওয়া যাক—

প্রাণহীন কবিদের বীণার ঝংকার।
বাণহীন ধনুকের ছিলার টংকার।

বাঙালি জাতির এটি পরম সৌভাগ্য,
হেন লোক নাই যার নাই বউ ভাগ্য।
(দুয়ানি, *পদচারণ* : প্রমথ চৌধুরী)

তেপাটির বেশ কয়েকটি কবিতায় প্রিয়সখির সঙ্গে প্রকৃতি ও প্রেমের সম্ভোগ। তারই একটি—

দেখ সখি আঁধারের পানে
চেয়ে আছে দুটি শুভ্র তারা।
দুটি শিখা বিকম্পিত প্রাণে
চেয়ে আছে স্থিররাত্রি-পানে,
আঁধারে রহস্যের টানে
দুটি আলো হয়ে আত্মহারা।
রাখ সখি জ্বেলে মোর প্রাণে
আলোভরা দুটি কালো তারা।
(মধ্যরাত্রি, তেপাটি, *পদচারণ* : প্রমথ চৌধুরী)

আগাগোড়া তেরজ়া রিমা ছন্দে লেখা তাঁর 'খেয়ালের জন্ম' কবিতাটি অনবদ্য। নানা বাদ্যযন্ত্রের বর্ণনা দিচ্ছে যার কয়েকটি পঙক্তি—

ঘিরে তাঁরে রেখেছিল শত শত যন্ত্রী,
কারো যন্ত্র রুদ্রবীণ কারো-বা রবাব—
স্পর্শে যার কেঁপে ওঠে হৃদয়ের তন্ত্রী।
কারো হাতে সপ্তস্বরা, যন্ত্রের নবাব,
ললিত গম্ভীর যার প্রসন্ন আওয়াজ,
মনের সুরের দেয় সুরেতে জবাব।
(খেয়ালের জন্ম, *পদচারণ* : প্রমথ চৌধুরী)

নিজের জীবনযাত্রার দর্শন ও নিজের কবিতা নিয়ে তিনি বেশ কয়েকটি সনেট লিখেছেন। তার দুয়েকটি দেখে নেওয়া যাক। নিজের সম্বন্ধে বলছেন—

মুখস্থে প্রথম কভু হইনি কেলাসে।
হৃদয় ভাঙেনি মোর কৈশোর-পরশে।

কবিতা লিখিনি কভু সাধু-আদিরসে।
...
পুত্রকন্যা হয় নাই বরষে বরষে।
অশ্রুপাত করি নাই মদের গেলাসে!

শেষ চার পঙ্‌ক্তি—

অন্যে কভু দিই নাই নীতি-উপদেশ।
চরিত্রে দৃষ্টান্ত নহি, দেশে কি বিদেশে।
বুদ্ধি তবু নাহি পাকে, পাকে যদি কেশ
তপস্বী হব না আমি জীবনের শেষে!
(ব্যর্থজীবন, *সনেট-পঞ্চাশৎ* : প্রমথ চৌধুরী)

একই সুরে সমচিন্তক বন্ধুকে বলছেন—

জীবনে জ্যাঠামি আর সাহিত্যে ন্যাকামি
দেখে শুধু আমাদের জ্বলে যায় গাত্র,
কারও গুরু নই মোরা, প্রকৃতির ছাত্র,
আজও তাই কাঁচা আছি, শিখিনি পাকামি।
(বন্ধুর প্রতি, *পদচারণ*, প্রমথ চৌধুরী)

আবার বন্ধুকেই পরিহাসছলে বলছেন তাঁর কবিতা লিখতে যাওয়ার তিন মুস্কিল নিয়ে—

কবিতা লিখেছি সখে, হয়েছে কসুর।
প্রথম মুস্কিল মেলা চরণে চরণ,
দ্বিতীয় মুস্কিল শেখা একেলে ধরন,
তৃতীয় মুস্কিল দেখি পাঠক শ্বশুর!
(কবিতা, *পদচারণ* : প্রমথ চৌধুরী)

শানিত এই কাণ্ডজ্ঞানের ছুরি, যা দিয়ে তিনি একই সঙ্গে সমাজকে এবং নিজেকেও ব্যবচ্ছেদ করছেন, তা প্রমথ চৌধুরীর কবিতার প্রধান অস্ত্র। তিনি বাংলা কাব্যকে ভুরি পরিমাণে বা বিভিন্ন রকমের দান দেননি। কিন্তু, যেটুকু দিয়েছেন তা অনবদ্য, তা মুছে যাওয়ার নয়।

স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে প্রশ্ন আসে, গদ্য অনেক লিখে গেলেও তিনি কবিতা কেন আরও লিখলেন না। স্মরণে আসে পরের যুগের আর এক আগন্তুক কবি সমর সেনের কথা, যিনি বাঙালি পাঠককে কিছু অরাবীন্দ্রিক গদ্যকবিতার উপহার দিয়ে প্রচুর প্রত্যাশা জাগিয়েই কবিতা লেখা বন্ধ করে দেন। আমাদের মনে পড়ে যায় *শেষের কবিতা*

উপন্যাসে বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ তাঁর তরুণ চরিত্র অমিত রায়কে দিয়ে নিজস্ব ভাষাভঙ্গিতে যে কথা বলাচ্ছেন, তার মোদ্দা কথাটা হল এই যে, কোনো কবিরই উচিত নয় তাঁর সৃষ্টিজীবনকে লঙ্ঘন করা। অর্থাৎ যেটুকু বলবার ছিল তা বলা হয়ে গেলে কলম তুলে রাখাই উচিত। এই আলোচনা শেষ করা যাক প্রমথ চৌধুরীর একটি ছোটো কবিতার পাঠে। তাঁর এই আত্মকথন যেন অনুজ সব লেখক-কবিদেরকে দেওয়া এক অমোঘ উপদেশ—

তোমাদের চড়া কথা শুনে
যদি হয় কাটিতে কলম,
লেখা হবে যথা লেখে ঘুণে,
তোমাদের কড়া কথা শুনে।
তার চেয়ে ভাল শতগুণে
দেওয়া চির লেখায় অলম্,
তোমাদের পড়া কথা শুনে
যদি হয় কাটিতে কলম।

(সমালোচকের প্রতি, *পদচারণ* : প্রমথ চৌধুরী)

(কবিতাগুলির পাঠ বিশ্বভারতী প্রকাশিত, পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত, সত্যজিৎ রায় প্রচ্ছদকৃত, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত *সনেট-পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা* থেকে নেওয়া। বানানের সমতা রক্ষার জন্য প্রধানত অধুনাচলিত বানানই দেওয়া হয়েছে। একটি কবিতায় পাঠভেদ আছে। সেটি হল— 'কবিতা লিখেছি শখে, হয়েছে কসুর।' কিন্তু তাঁর পাণ্ডুলিপিতে 'সখে' পাঠটি আছে বলে ঐটিই নেওয়া হয়েছে।)